শরৎ-উপন্যাসে বৃত্তিজীবীর সামাজিক অবস্থান ও সংকট

রাকেশ জানা

শরৎচন্দ্র যখন সাহিত্য রচনা শুরু করেন তার পূর্বে বাংলাদেশে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনের ঝড় বইছে। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে এসে এই ঝড় কিছুটা স্তিমিত হয়। এরপর ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ এল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত নিয়ে। আফ্রিকা থেকে গান্ধীজি দেশে তখন প্রত্যাবর্তন করেছেন। যুদ্ধ শেষে ব্রিটিশ সংকারের ভারতবর্ষকে স্বরাজ্য শাসনের অধিকার প্রতিশ্রুতি নিছকই ছলনায় পর্যবেশিত হয়। গান্ধীজির নেতৃত্বে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনায় যুবসমাজ মেতে ওঠে। এরপর হঠাৎ অসহযোগ আন্দোলন ক্রমশ সংসাত্মক হয়ে উঠলে গান্ধীজি আকস্মিকভাবে এই আন্দোলন স্তব্ধ করে দেন। ফলে যুব সমাজে দ্বিগুণ হতাশা ও বিভ্রান্তি ছড়ায়। এরপর এল বিশ্বব্যাপী আর্থিক বিপর্যয়, তীব্র বেকার সমস্যা। এইসবকিছুই যুবসমাজের চিত্তে একটা অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার যন্ত্রণা নিয়ে এল। শরৎসাহিত্যের যুগ মূলত এই কাল। তবে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে স্বদেশি যুগে শরৎচন্দ্র বাংলা তথা ভারতবর্ষে ছিলেন না, ছিলেন বার্মা মুলুকে। মোটামুটিভাবে ১৯০৩ থেকে ১৯১৬ মে পর্যন্ত, তিনি বাংলা দেশে ছিলেন না। তবে বাংলায় প্রত্যাবর্তনের পর ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তাই এই সময়ে যুবসমাজের অস্থিরতা ও বেদনার সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন না এমন নয়।

শরৎচন্দ্র সাহিত্যজগতে আসার পূর্বে বাংলা সাহিত্য ছিল একান্তভাবে অভিজাত, উচ্চবিত্ত কখনো কখনো মধ্যবিত্তের মূল্যবোদের দ্বারা শাসিত। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বেশিরভাগ চরিত্র প্রায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় লালিত গ্রামীণ ভূম্যধিকারী শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষক। তাঁর নায়কনায়িকারা কদাচিত অন্য সমাজ থেকে আহূত হয়েছে। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের চরিত্রের নির্বাচনে গ্রাম্য সমাজ সেভাবে প্রাধান্য পায়নি যতটা পেয়েছে শহুরে উচ্চবিত্ত সমাজ। তাঁর 'চোখের বালি', 'গোরা', 'চতুরঙ্গ' (ঘরে বাইরে যোগাযোগ বাদে) শেষের সবকটি উপন্যাসে রয়েছে নাগরিক উচ্চশিক্ষিত বিত্তস্বচ্ছল পরিবারের ব্যক্তিবর্গের প্রাধান্য। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ক্ষেত্রে গ্রামীণ সমাজচিত্রণ এর অভাব পূর্ণ করেছে। 'শরৎচন্দ্রই' প্রথম লেখক, যিনি সজ্ঞানে বাংলা উপন্যাসের এ যাবত অনুসৃত অভিজাত ও উচ্চবৃত্তের মূল্যবোধ ভেঙে তার মধ্যে মধ্যবৃত্ত মানসকিতার আবাহন করলেন এবং সে মধ্যবৃত্ত মানসিকতাও নাগরিক মধ্যবিত্ত মানসিকতা নয়, একান্ত গ্রামকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত মানসিকতা। উপরে জমিদার শ্রেণী ও নীচে শোষিত ও অবজ্ঞার স্তরের একাধিক শ্রমজীবী শ্রেণী, যথা কৃষক, মজুর, বর্গাদার চাষী ও ভূমিহীন নিঃস্বের দল—এই দুই প্রান্তীয় সীমার স্তরে যে অগণিত সাধারণ মানুষ গ্রাম্য সমাজে বিরাজ করে এবং 'ভদ্রলোক' রূপে কথিত হয়, তাদেরই প্রতিনিধি স্থানীয় অনেক বিশিষ্ট নর-নারীর চরিত্র তিনি উপস্থিত করেছেন তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্প দুই

শিল্পরূপের আধারেই''[১] তবে আমাদের ভুললে চলবে না তাঁর শিল্পদৃষ্টি একান্তভাবে মধ্যবিত্ত সমাজের স্তরেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি তা ওই স্তরের গণ্ডি ছাপিয়ে নিঃস্ব সমাজের মধ্যেও প্রবেশ করেছে। মহেশ, অভাগীর স্বর্গ, বিলাসী প্রভৃতি ছোটগল্প, পল্লীসমাজ, দেনা-পাওনা, শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্ব ও পথের দাবী উপন্যাসে শ্রমিক ব্যারাকের চিত্রালয়ে এই সমাজের জন্য তাঁর করুণা বা বেদনা প্রকাশিত।

সমাজে পরশ্রমজীবী জমিদার, জোতদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণ উৎপীড়ন যে কত নির্মম ও নগ্ন ছিল এই কঠিন বাস্তবকে শরৎচন্দ্র সহানুভূতি দিয়ে প্রকাশ করেছেন। তাঁর দুটি বিখ্যাত গল্প 'মহেশ' ও 'অভাগীর স্বর্গ'-এ সমাজের শোষক ও শোষিত শ্রেণীর নিখুঁত চিত্র বর্তমান। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে দেখতে পাই কুঁয়াপুরে ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামকে। অর্থাৎ এই গ্রামে ক্ষমতায় ব্রাহ্মণেরা। যদিও সমাজ কথিত ছোটোজাত যথা কৈবর্ত চাষী, জেলে, সদগোপ, ধোপা, নাপিতেরও বসতি আছে; মোটকথা গ্রামটিতে চাষা-ভুরোদের বাসই অধিক। আর গ্রামের খালের ওপারে পিরপুরে মুসলমান প্রজাদের বাস। এই কুঁয়াপুর গ্রামের সমাজপতি হলেন জমিদার বেণী ঘোষাল। প্রাজারা তাঁকে খাজনা দিয়েই জমির ভোগদখল করে। তবে কৃষকেরা দারিদ্র্যের শিকার, এর কারণ জানা যায় রমেশের অনুসন্ধানে—'প্রত্যেক গ্রামেই কৃষকদিগের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, অনেকেরই একফোঁটা জমি-জায়গা নেই, পরের জমিতে খাজনা দিয়ে বাস করে এবং পরের জমিতে 'জন' খাটিয়ে উদরান্নের সংস্থান করে। দুদিন কাজ না পাইলে কিংবা অসুখে-বিসুখে কাজ না করিতে পরিলেই সপরিবারে উপবাস করে। খোঁজ করিয়া আর অবগত হইয়াছিল যে, ইহাদের অনেকেরেই একদিন সঙ্গতি ছিল, শুধু ঋণের দায়েই সমস্ত গিয়েছে। ঋণের ব্যবস্থাও সোজা নয়। মহাজনেরা জমি বাঁধা রাখিয়ে ঋণ দেয় এবং সুদের হার এত অধিক যে, একবার যে কোনো কৃষক সামাজিক ক্রিয়াকর্মের দায়েই হোক বা অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টির জন্যই হোক, ঋণ করিতে বাধ্য হয়, সে আর সামলাইয়া উঠিতে পারে না। প্রতি বৎসরই তাকে এই মহাজনের দ্বারে গিয়া হাত পাতিতে হয়।''[২] আর বেণীর মতো জমিদাররা যেখানে মহাজনের গদিতে বসে, সেখানে তাই সর্বশান্ত না হয়ে চাষাদের উপায় থাকে না। এসব লক্ষ করে রমেশের গ্রামাঞ্চলে অশিক্ষিত প্রজার শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতি হিতৈষী কার্যকলাপে বেণীর স্বার্থে আঘাত লাগে। তাই রমাকে হাতে এনে বেণী রমেশের বিরুদ্ধে নানা কূটকৌশল রচনা করেছে। জমিদার রমার জন্য বেণী এতদিন যে আদালত ও জর্জ ম্যাজিস্ট্রেটকে নিজের পক্ষে নিয়ে আসত, আর তারই আইনি সহায়তায় রমেশকে চক্রান্ত করে জেলে পাঠিয়েছে। আসলে শরৎচন্দ্র জানতেন ইংরেজ সরকারের বিচারব্যবস্থা পক্ষপাতশূন্য ছিল না। বরঞ্চ তা ছিল ধনীর স্বার্থে প্রজাধ্বংসের হাতিয়ার। জমিদারের এই সুবিধা ভোগের দরুনই প্রজাদের এত দুর্ভোগ। তাই ন্যায়ের দরজায় কড়া নাড়তে তারা ভয় পেত, এযাবত আপোষই ছিল তাদের মাত্র পথ। কিন্তু রমেশের সর্বনাশে তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। তাই বেণীর এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়িয়েছে। শরৎচন্দ্র যেভাবে দরিদ্র প্রজাসাধারণের জন্য আর্থিকমুক্তিজনিত সংগ্রামের পথ অনুসরণ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হচ্ছিলেন হঠাৎ আপোষ পন্থায় তার গতি

রুদ্ধ হল। তিনি কোনো স্থায়ী সমাধানের ইঙ্গিত না দিয়েই উপন্যাস সমাপ্ত করলেন। প্রজাদের মধ্যে যে শোষণ বিরোধী চেতনা ও জমিদারি প্রথা বিচ্ছেদের বীজ উপ্ত হয়েছিল তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল।

এই উপন্যাসেই লক্ষ করা গেছে চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন প্রজা জমিদার শ্রেণী তথা সমাজ মাতব্বরদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। ক্ষ্যান্তি বামনি ঠিক এইরকমই চরিত্র। সে মুড়ি বেচে খায়। গোবিন্দ গাঙ্গুলী ও পরাণ হালদারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। রমেশের সেবামূলক কাজের প্রশংসা শুনে কুঁয়াপুর গ্রামের হেডমাস্টার নবমালী পাঁড়ুই তার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। আসলে সে সময়ে শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা এখানকার মতো ছিল না। পারিশ্রমিক ছিল এমনিতেই কম তার উপরে স্কুল সেক্রেটারির মারফত ওই টাকা শিক্ষকদের হাতে পেতে পেতে প্রায় অর্ধেক কমে যেত। এই উপন্যাসে একটি হারিয়ে যাওয়া বৃত্তি লেঠেলদের উল্লেখ রয়েছে। জমিদার শ্রেণীর পিরপুরের প্রজা আকবর লেঠেলরা, 'সাবেক দিনে লাঠির জোরে অনেক বিষয় হস্তগত করিয়া দিয়াছে। বর্তমানে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ লোপ পাওয়ায় এদের আর দেখা যায় না। তাই তো বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে লাঠির ঐতিহ্য হারানোর আক্ষেপ ধ্বনিত হয় 'হায় লাঠি? তোমার দিন গিয়াছে।'[১৩]।

'দেনাপাওনা' উপন্যাসেও অর্থনৈতিক সংগ্রামের চিত্র শরৎচন্দ্র অপূর্ব দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। উপন্যাসে চণ্ডীগড় গ্রাম বীজগাঁয়ের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রামে চণ্ডীমন্দিরের অনতিদূরে ভূমিজ প্রজাদের বাস। এই ভূমিজ প্রজাদের জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী শহরে থাকে। গ্রামে অর্থের প্রয়োজনেই কখনো কখনো তার অবির্ভাব আসলে তাঁর জমিদারি পরিচালনা করে গোমস্তা নায়েব, পাইক পেয়াদা, কর্মচারী ও ভৃত্যরা। সুতরাং গ্রামে প্রজাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে এই মধ্যবর্তী শ্রেণীর মারফতই খাজনা আদায় হয়, ফলে এই সব কর্মচারীদের অত্যাচার ও শোষণে কৃষকপ্রজা নিঃস্ব হয়ে পড়ে। বাংলার জমিদার গ্রাম থেকে শহরমুখী জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলে, আর উপস্বত্ব ভোগীদের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র কায়েম করলে প্রজাসাধারণের মঙ্গলার্থ সূচিত হয় না উল্টে শোষণের মাত্রা বেড়ে যায়। ঠিক এই প্রকার অবস্থার বর্ণনা শরৎচন্দ্র 'বড়দিদি' উপন্যাসে ও 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে করেছেন। শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্বে এই সমস্যা সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। 'অভাগীর স্বর্গ'-এ গোমস্তা অধর রায়, 'বড়দিদি'র চাটুজ্যে মশাই ও ম্যানেজার মথুর বাবুর মতোই 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের জনার্দন রায় ও এককড়ি নন্দী অর্থপিশাচ জমিদার গোষ্ঠীর সমগোত্রীয় শ্রেণীচরিত্র।

জমিদার ও তার কর্মচারীদের অত্যাচারে গ্রাম বাংলার দুঃস্থ কৃষকেরা জমি-জমা, হাল, বলদ হারিয়ে অন্যায়ভাবে উৎখাত হয়ে সর্বহারা হয়ে জনমজুর খাটত নয়তো শ্রমিক শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হত। এই অবস্থায় বিদ্রোহী চেতনা যে ঘণীভূত হচ্ছিল না তা নয় তবে তা প্রকাশ পেতে কিছু দেরি ছিল। গ্রামের দক্ষিণে সমস্ত মাঠ যা এতদিন পুরুষানুক্রমে প্রজারা ভোগ করে এসেছে তা জমিদারের তরফ থেকে মাদ্রাজি সাহেবকে বিক্রি করার কথা উঠলে, ষোড়শী জমিদারের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রজাদের উজ্জীবিত

করে। কিন্তু যে শ্রেণী সংঘর্ষ দানা বাঁধছিল তা অচিরেই ভেঙে খান খান হয়ে গেল। প্রজাসাধারণ জমিদারকে প্রবল প্রতিপক্ষ মনে করে নিজেদের অক্ষম ভেবে আপোষের পথ নিল। ষোড়শী ও সাগরের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হল। অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করে ষোড়শী একজন প্রজাকেও চণ্ডীমন্দিরের চত্বরে পরামর্শ করতে আসতে দেখেনি। প্রবলের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি অসহায় দুর্বলের নেই তাই বিবাদ করা মানে নিজের বিপদ ডেকে আনা। এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্র যে অত্যাচারী, লম্পট, মদ্যপায়ী জমিদার জীবানন্দ চৌধুরীকে এঁনেছিলেন ষোড়শীর সংস্পর্শে এসে সেই অত্যাচারী দুধে জমিদার মানবতাবাদী প্রজাদরদী হয়ে পড়ল। শরৎচন্দ্রের গভীর সহানুভূতি পেয়ে এই প্রজাশোষক শ্রেণীপ্রতিভূ, উপন্যাস শেষে গ্রামোন্নয়নে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ফলে উপন্যাসের সূচনায় যে শ্রেণী সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিলে তা একপ্রকার কাহিনীর মোড়ে বিপ্লবের পথ পরিহার করে জমিদারের মহাত্ত্বকথায় রূপান্তরিত হল।

শরৎ সাহিত্যে 'দেনাপাওনা' যেমন কৃষক শ্রেণীর দুঃখ দুর্দশার চিত্র রয়েছে ঠিক তেমনি 'পথের দাবী' উপন্যাসে রয়েছে শ্রমিক শ্রেণীর শোষিত অসহায় জীবনের চিত্ররূপ। যদিও এর স্থান বার্মা মুলুক তথাপি শ্রমিক শোষণের ইতিহাসে দেশভেদে কোনো পার্থক্য চোখে পড়ে না। শরৎচন্দ্র এই উপন্যাস রচনার পূর্বে সমকালের সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। বাংলাদেশে সে সময় 'সোশ্যালিস্ট পার্টি' বা সমাজবাদী দল গঠনের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। শ্রমিকদের ওপর মালিক পক্ষের অকথ্য অত্যাচার, উৎপীড়ন ও নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ গণঅভ্যুত্থান যে হবেই একথা শরৎচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন। ১৯২৭-২৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের শ্রমিক ইউনিয়নগুলো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। নানা জায়গায় এই ইউনিয়ানের নেতৃত্বে ধর্মঘট ঘটে। এই সময় হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির ঝাড়ুদার ও মেথরেরা ধর্মঘট করে তাদের ন্যায্য দাবিদাওয়া আদায় করে। সমাজ অবহেলিত এই ব্রাত্য সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিম্নবর্গের জয় ঘোষিত হয়। যা অন্যান্য শ্রেণীকেও উদ্বুদ্ধ করে। 'পথের দাবী' উপন্যাসটি রাজনৈতিক, দেশাত্মবোধ ও জনজাগরণের পটভূমিতে লেখা। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামই একমাত্র স্বাধীনতা আনয়নের পন্থা এই কথা বিপ্লবী নায়ক সব্যসাচীর আদর্শ। এই কারণবশত উপন্যাসটি রাজদ্রোহিতার অভিযোগে নিষিদ্ধ হয়। এই উপন্যাসের কর্মপন্থা হল কুলি মজুর শ্রেণীর উন্নতি সাধন। কৃষক শ্রেণী বড়ো বেশি রক্ষণশীল বলে তাদের উপর সব্যসাচীর ভরসা নেই। তাঁর ধারণা দেশের নিম্নবর্গ কৃষক কোনোদিনই বিপ্লবের হাতিয়ার হতে পারে না। কৃষকদের অর্থনৈতিক শোষণমুক্তির জন্য ভারতী দেবীর প্রয়াস ও সচেতনতা লক্ষ করা গেলেও, সব্যসাচী এতে কোনো ভূমিকা পালন করেননি। শ্রমিক মঙ্গল আধুনিক কালের ভাষায় ট্রেড ইউনিয়ান এর দ্বারা তাঁর সঙ্গীরা কাজকর্ম চালালেও তিনি জানেন এই কর্মও অর্থহীন হতে বাধ্য।

তাঁর 'বিপ্রদাস' উপন্যাসের সূচনাতেই গ্রামের নিম্নবর্গ চাষী ও মজদুর শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক সচেতনতা লক্ষ করা গেছে। বলরামপুর গ্রামের রথতলার বৈঠকে চাষা-ভূষাদের সঙ্গে রেললাইনের 'কুলিগ্যাং'-ও যোগ দিয়েছে। সেখানে নামকরা বক্তার ভাষণে

আধুনিককালের 'অসাম্য' ও 'অমৈত্রীর' বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। তাঁরা কৃষক-মজুরদের সাম্যবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে চান। কিন্তু দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী দ্বিজদাসের মধ্যে যে বিপ্লবী মহান সত্তার সম্ভাবনা লক্ষ করা গিয়েছিল তা যেন উপন্যাস শেষে কোথায় হারিয়ে গেল। তাই ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন : 'দ্বিজদাসের রাজনীতি করাকে লেখক পরিহাসের স্তরে নিয়ে গিয়েছেন। জমিদারি উচ্ছেদকামী দ্বিজদাস স্বাধীনভাবে জমিদারি পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে বড়ো জোর একজন বেনেভোলেন্ট জমিদার হতে পারে-শ্রমিক-কৃষক- আন্দোলনের সংস্পর্শের ফল এইটুকুই। তাও মায়ের ব্রত উদযাপনের ঢালাও বন্দোবস্ত দেখে মনে হয় না। ধনাঢ্যের এরকম অর্থহীন এলাহি কারবর করতে করতে শেষ অবধি বেনেভোলেন্স উৎসবান্তে খিচুড়ি -বিদায়ের মুষ্টিভিক্ষার চেয়ে বেশিদূর এগোত না'।[৪]

শরৎচন্দ্রে 'বিরাজ বৌ' উপন্যাসে মূল বিষয় একবারে সাদামাটা। সাধ্যের বাইরে গিয়ে অসম বৈবাহিক সম্বন্ধ অনেক সময় আর্থিক দুগর্তির কারণ হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে ও রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' ছোটগল্পে এই অবস্থার ইঙ্গিত আছে। বোনের বিয়ে দিতে গিয়ে নায়ক নীলাম্বর আরও গরীব হয়। ভাই পীতাম্বরের সঙ্গে শরিকি ভাগেও তার লোকসান ঘটলে সে নীরব থাকে। এরপর গ্রামের জমিদারের লোলুপ দৃষ্টি তার স্ত্রী বিরাজের ওপর পড়লে বিপত্তি ঘনিয়ে আসে। লোলুপ জমিদার বিরাজের দ্বারা প্রত্যাখাত হয়েও আশা ছাড়ে না। অতঃপর সাংসারিক অভাব অনটনে বিরাজের পূর্বের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা নষ্ট হয়। স্বামীর সঙ্গে সে ঝগড়া করে মান-অভিমানে ঘর ছেড়ে জমিদারের নৌকায় ওঠে। কিন্তু বোধ ফিরতেই নৌকা থেকে ঝাঁপ দিয়ে নদীতে পড়ে, ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায়। কিন্তু তার আর গৃহপ্রত্যার্পণ সম্ভব হয় না। তাই নিজের পেটের তাগিদে কখনো দাসীবৃত্তি, কখনো ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে করতে একদিন হঠাৎ স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাত হয়। কিন্তু ততদিনে সে সাংঘাতিক অসুস্থ, বিকলাঙ্গ হয়েছে। অবশেষে স্বামী, ননদ, ভাজ সকলকে কাঁদিয়ে মৃত্যু বরণ করে। উপন্যাসে আর্থিক অনটন ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। নীলাম্বরের বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনা ও শিষ্যবাড়ি থেকে প্রণামী ইত্যাদি আদায়-উসুল প্রসঙ্গে তার নির্বিকার গাছাড়া ভাব সংসারে অভাব ডেকে আনে। তাও বিরাজের প্রচেষ্টায় এই সংসার কিছুদিন চলে। মগরার গঞ্জের পিতলের কল্কার কারখানার মাটির ছাঁচ তৈরি ও বিক্রি করার কৌশল চাঁড়ালদের মেয়ের কাছ থেকে আয়ত্ত করে বিরাজ অভাবের সংসারে কিছু উপার্জন করে দুঃখ মোচনের দায় নিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন মগরায় ওই পিতলের কারখানাও বন্ধ হয়ে যায়। বিরাজ কর্মচ্যুত হয়। কিন্তু খবর আসে নীলাম্বর আগামী পূজাতে কলকাতার এক নামজাদা কীর্তনিয়ার দলে খোল বাজানোর বায়না পায়। কিন্তু খবর শুনে খুশি হবার চেয়ে বিরাজ এতে আশঙ্কিত হয় কেন না— 'তাহার স্বামী গণিকার অধীনে, গণিকার সংস্রবে সমস্ত ভদ্র সমাজের সম্মুখে গাহিয়া বাজাইয়া ফিরিবে। তবে তাহার জুটিবে'![৫] বিরাজের অত্যাধিক ভালোবাসা ও স্বামীকে আগলে রাখাই নীলাম্বরকে বাজনাদারের কর্মে যেতে বাধা প্রদান করেছে। এই উপন্যাসে নীলাম্বরের ভাই পীতাম্বরের জীবিকাটি লেখকের তীক্ষ্ণ নজরে

পরিস্ফুট হয়েছে। পূর্বাপর উপন্যাসে এইধরনের জীবিকা প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়নি। আদালত চত্বরে পীতাম্বরের মতো মুহুরিকে বসে থাকতে দেখা যায়- ''সকালবেলা ভাত খাইয়া দপ্তর বগলে করিয়া হুগলীর আদালতের পশ্চিমদিকে একটা গাছতলায় বসিত এবং সমস্তদিন আর্জি লিখিয়া যা উপার্জন করিত, সন্ধ্যার পূর্বে বাড়ি ফিরিয়া সেগুলো বাক্সে বন্ধ করিয়া ফেলিত''। আজও আদালত চত্বরে এই দরখাস্ত লিখে দেওয়া থেকে শুরু করে ফর্মপূরণের জন্য লোকে বসে থাকে , তারা এর বদলে কিছু পারিশ্রমিক নিয়ে থাকেন।

শরৎচন্দ্রে 'পরিণীতা' উপন্যাসটি ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের ঘটনাস্থল কলকাতা। কলকাতার পাশাপাশি দুই বাড়ির মানুষজনকে নিয়েই ঘটনাক্রম তৈরি হয়েছে। নবীন রায়ের সঙ্গে প্রতিবেশী গুরুচরণের সম্পর্কটা ছিল মহাজন ও খাতকের। তবে বাড়ির অন্দরমহলে মমতা ও প্রীতির বন্ধন ছিল। নবীন রায়ের ছিল টাকা ঋণের বদলে মর্টগেজের কারবার। তিনি প্রথমে গুড়ের ব্যবসা করতেন, বর্তমানে শুধুই তেজারতি ব্যবসা করেন। অন্যের ভাত মেরে সম্পত্তি বৃদ্ধিই তাঁর কাজ, এতেই তাঁর অনন্দ। এই মহাজনি ব্যবসার দৌলতে তিনি রক্ষণশীল হিন্দুয়ানির ধ্বজা ধরেছেন। সে তুলনায় গুরুচরণ ছাপোষা ভদ্রলোক, ষাট টাকা বেতনের ব্যাঙ্কের কেরানি। গতবছর তার দ্বিতীয় কন্যার শুভবিবাহে বৌবাজারের এই দ্বিতল বাড়িটি বাঁধা পড়েছে নবীন রায়ের কাছে। তাঁর দারিদ্র্যের সংসার তবে তিনি সদাশয় ব্যক্তি নিজের মেয়ে ও আশ্রিতা ভাগ্নী ললিতার মধ্যে পার্থক্য করেন না। তাঁর চিন্তা বাড়িবন্ধকের ঋণ পরিশোধ করা ছাড়াও বাড়ির অন্যান্য মেয়ে ভাগ্নীর বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবা। কারণ মেয়েরা অরক্ষণীয়া, বয়স বেড়ে গেলে সমাজপতিরা একঘরে করবে। আর যেখানে নবীন রায়ের মতো তেজারতি ব্যবসায়ী সমাজপ্রধান সেখানে এই সমাজভীতি না হয়ে পারে না।

শরৎচন্দ্রের 'পণ্ডিত মশাই' উপন্যাসটিতে দেখা যায় গ্রাম্য মানুষের অশিক্ষা তথা অজ্ঞতার দরুন উপকারী বা সেবাকারীকে এরা চরম আঘাত করে ফেলে। উপন্যাসের নায়ক বৃন্দাবন ও কেশব অবস্থার শিকার। যদিও বৃন্দাবন ও কুসুমের মানসিক টানাপোড়েনে উপন্যাসের কাহিনীটি বিন্যস্ত হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক বৃন্দাবন বোষ্টম সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত লোক, সম্পন্ন গৃহস্থ। তার নিজের বাড়িতেই বাড়ল গ্রামের নিম্নবর্গের শিক্ষার জন্য পাঠশালা খোলে। কারণ সে জানে শিক্ষা ছাড়া দেশের উন্নতি হবে না। এমনকি পাঠশালায় ছাত্রছাত্রীদের সমস্ত খরচ তার, তাদের জলপানের ব্যবস্থাও তার ঠাকুরদালানে হয়। এরপর গ্রামে হঠাৎ ওলাওঠা মহামারীর প্রকোপ পড়ে। সে নিজ মালিকানায় পানীয় জলের পুকুরটাকে সারা গ্রামের জন্য সংরক্ষিত রাখার চেষ্টা করতে পুকুরের জলে স্নান ও কাপড় কাচা নিষেধ করেন। এতে সে গ্রামস্থ উচ্চবর্ণের মানুষজনের বিরাগভাজন হয়। এরপর গ্রামে মড়ক লাগলে বাড়িতে তার মা বোনও অসুস্থ হয়। উচ্চবর্ণের বিদ্বেষের কারণে গ্রামস্থ গোপাল ডাক্তার তার বাড়িতে চিকিৎসা করতে অস্বীকার করে। তাই বিনা চিকিৎসায় বৃন্দাবনের মা ও তার পুত্রের মৃত্যু হয়। এই উপন্যাসে কুসুম বাল্যকালে বৃন্দাবন কর্তৃক পরিত্যক্তা বধূ। সে তখন থেকেই মাতৃগৃহে প্রতিপালিত হয়ে আসছে।

ক্রমশ মা মারা গেলে ভাইয়ের আশ্রয়ে থেকেছে কিন্তু শ্বশুড় গৃহ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেও সে অরাজি হয়েছে। কুসুমের ভাই 'কুঞ্জ ফেরিওলার ব্যাবসা করে। একটি বড়ো ধামায় ঘুনসি, মালা, চিরুনি, কৌটা, সিঁন্দুর, তেলের মশলা, শিশুদের জন্য ছোটো বড়ো পুতুল প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য এবং কুসুমের হাতে নানাবিধ সূচের কারুকার্য ইত্যাদি মাথায় লইয়া পাঁচ সাতটা গ্রামের মধ্যে ফেরি করিয়া বেড়ায়''। শরৎচন্দ্রে দৃষ্টি যে সমাজের নিম্নবিত্তের মানুষদের মধ্যেও ঘোরাফেরা করেছে কুঞ্জ ফেরিওয়ালা তার প্রমাণ। উপন্যাসে বৃন্দাবনের বন্ধু কেশব উচ্চশিক্ষিত কলেজ অধ্যাপক। কিন্তু গ্রামের সেবাব্রতীর ভূমিকা পালন করে কোনো উচ্চাশার লোভ না রেখে গ্রাম্য মানুষদের অজ্ঞতায় নিরুদ্যম না হয়ে গ্রামেই থেকে গেছে শিক্ষকতা করতে। তাঁর কাছে টাকা রোজগার আর উন্নতি এক নয়। তিনি উন্নতি বলতে গ্রাম্য সমাজের অজ্ঞতা মুক্তিকেই দেখেন। এই চরিত্রটির আদর্শ ও মহানুভবতার প্রশংসা করে বৃন্দাবন গ্রাম্য দুর্গতি মোচনে শহুরে ডাক্তার অবিনাশকে বলেছে—''আজ আমার দুর্দশা দেখে শিউরে উঠছেন, এমনি দুর্দশায় প্রতি বৎসর কত শিশু, কত নরনারী হত্যা হয়, সে কি কারো কোনোদিন চোখে পড়ে? ডাক্তার বাবু, কিন্তু যারা আপনাদের মুখের অন্ন, পরনের বসন যোগায়, সেই হতভাগ্য দরিদ্রের এইসব গ্রামে বাস। তাদিকেই দুপায়ে মাড়িয়ে থেঁতলে থেঁতলে ওপরে ওঠার সিঁড়ি তৈরি হয়। সেই উন্নতির পথ থেকে কেশব এম.এ. পাশ করেও স্বেচ্ছায় মুখ ফিরিয়ে দাড়িয়েছে।'' শরৎচন্দ্র বৃন্দাবনের মুখ দিয়ে কৌশলে গ্রাম্য দুর্গতি মোচনের কথা তথা চিকিৎসা ক্ষেত্রে সুব্যবস্থা ফেরানোর একটা উপায় বের করেছেন তা ভুললে চলবে না।

'শ্রীকান্ত' চারটি পর্ব মিলিয়ে (১ম-১৯১৭, ২য়-১৯১৮, ৪র্থ-১৯৩৩) সম্পূর্ণ। এই উপন্যাসটি এপিসোডধর্মী। শ্রীকান্ত-ইন্দ্রনাথ এপিসোডে আমার দেখতে পাই ফুটবল মাঠে মারমুখী জনতার হাত থেকে শ্রীকান্তকে উদ্ধার করার পর ইন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে শ্রীকান্ত মুগ্ধচিত্ত। সে গভীর রাতে সাপ-খোপের ভয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করে বাঁশি বাজিয়ে দুর্গম পথে ঘুরে বেড়ায়। এই বিচিত্র কর্মকাণ্ড ছাড়াও তার নির্ভিক চরিত্রের পরিচয় পাই শ্রীকান্ত বহুরূপীর রহস্য মোচনে। 'সেকালের বাস্তব জীবনের একটুকরো ছবি এর মধ্যে আছে বহুরূপীদের বাড়ি বাড়ি অভিনয় দেখাবার লোকবিনোদন, তেমনি গম্ভীর কর্তা-ব্যক্তিদের ভীতি এবং মিথ্যা আস্ফালন ব্যঙ্গ ও কটাক্ষের বিষয় হয়ে উঠেছে''। বর্তমানে এই বহুরূপীদের জীবিকা মৃতপ্রায়। শুধুমাত্র গাজন ও দশেরা উপলক্ষে গ্রাম ও শহরে মাঝে মধ্যে এদের লক্ষ করা যায়। আসলে যন্ত্র সভ্যতা লোকবিনোদনের আধুনিক উপকরণ নিয়ে এলে এই বিনোদন তাদের কাছে ম্লান হয়ে পড়ে। শ্রীনাথ বহুরূপীরা এভাবেই লুপ্ত হয়ে থাকে। এই উপন্যাসে শাহজি সাপুড়ের কথা ইন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে এসেছে। এই শাহজির কাছে ইন্দ্রনাথ হল সোনার ডিম দেওয়া হাঁস। ইন্দ্রের কাছ থেকে টাকা হাতানোর জন্যই ইন্দ্রকে সে সাপের বিষ নামানোর মন্ত্র শেখাবে বলে আশ্বাস দেয়। আসলে সাপুড়েদের সবটাই বুজরুকি, লোকঠকানোর কৌশল। অন্নদাদির মুখেই এই সত্যতা পরিষ্কার হয়ে যায় সাপুড়ে কড়িচালা, ঘরবন্ধন, দেহবন্ধন এইসব মন্ত্র শুধু লোক দেখানো ঠকবাজি।

অন্নদা তাই ইন্দ্রকে বলেছে 'আমার এই কথাটুকু আজ শুধু বিশ্বাস কোরো ভাই, আমাদের আগাগোড়া সমস্তই ফাঁকি। আর তুমি মিথ্যে আশা নিয়ে শাহজির পেছনে ঘুরে বেড়িও না। আমরা তন্ত্র মন্ত্র কিছুই জানিনে, মরা বাঁচাতেও পারিনে। আর কেউ পারে কিনা, জানিনে, কিন্তু আমাদের কোনো ক্ষমতাই নেই''। আসলে সাপুড়েরা যে সাপ ধরে তা শুধু হাতেরই কৌশল, মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই নয় এই কথা শরৎচন্দ্র তাঁর 'বিলাসী' গল্পে (১৯১৮) চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। এই গল্পে শরৎচন্দ্র বড়ো রকমের শিক্ষা দিয়ে যান-কুসংস্কার মোচনের। 'বিলাসী'র মৃত্যুঞ্জয়ের মতো 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসেও শাহজির মৃত্যুও সর্পদংশনেই ঘটে। শ্রীকান্ত ভালো শিকারী ও গানের সমঝদার শ্রোতা, বিহারের জমিদার বন্ধু কুমার সাহেবের আমন্ত্রণে তাঁর তাঁবুতে এসেছে। এ প্রসঙ্গে একথা বলার আছে যে ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে শরৎচন্দ্র জনৈক মহাদেব সাহুর বাড়িতে গায়ক ও বাদকের চাকরি গ্রহণ করেন। এই মহাদেবেরই বিশিষ্ট বন্ধু উকিল শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুজাফফরপুরের বাড়িতে অতিথি হিসাবে প্রায় দুমাস ছিলেন। আসলে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে কুমার সাহেবের চরিত্রটি যে মহাদেব সাহুর আদলেই তৈরি আর এখানেই পরিচয় হয় পিয়ারি বাইজির সঙ্গে, যে কিনা একদা শ্রীকান্তের বাল্যসঙ্গিনী ছিল। তখনকার সময়ে ধনীগৃহে কিংবা তাদের বাগানবাড়িতে বাইজির আগমন ঘটত। তাদের সুমধুর কণ্ঠ ও নৃত্যের আনন্দ ওঠাতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের আগমন ঘটত। পরবর্তীকালে তারাশংকরের 'জলসাঘর' গল্পে এই শ্রেণীর পরিচয় রয়েছে। বর্তমানে এই জীবিকাটি লুপ্তপ্রায় তবে এর অভাব পূর্ণ করেছে সম্প্রতি ড্যান্সবারগুলো।

শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্বে ভ্রমণ অভিজ্ঞতার সূত্রে নানা জীবিকার লোকেদের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে, বিশেষ করে বার্মা বাসকালীন। শ্রীকান্তের রেঙ্গুন যাত্রা পর্বে জাহাজে নন্দ মিস্ত্রী ও টগরের প্রসঙ্গ রয়েছে। অভয়া কাহিনীর সূত্রপাতও এই জাহাজেই। জাহাজে বহুমানুষ কর্মের সন্ধানে বার্মা চলেছে, এদের মধ্যে কেউ বার্মা মুলুকে কাজ করে। এদের মধ্যে কেউ মিস্ত্রি, কেউ দর্জি, কেউ বা শ্রমিক। জাহাজের কর্মী হিসেবে যেমন রয়েছে কুলি খালাসির দল, তেমনি রয়েছে ডাক্তার, ক্যাপ্টেন ও তাঁর অধস্তন কর্মচারীরা। জাহাজে শুধু বাঙালী বা হিন্দুস্থানি নয় বিদেশি(চীনা)-রাও বার্মা মুলুকে কর্মের সন্ধানে ছুটে যাচ্ছে। যদিও শরৎচন্দ্র ফলাও করে বার্মার জীবনের কথা বলতে বাসেননি, কিন্তু শ্রীকান্তের বার্মা বাসকালীন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাঙালী জীবনের পরিচয় আভাসে ইঙ্গিতে ধরা পড়েছে। মনে হয় ভারতবর্ষের কর্মসমস্যাই বাঙালী তথা ভারতীয়দের বার্মামুলুকে গন্তব্যের মাত্র কারণ। বার্মা মুলুকে পরিশ্রম করলে অর্থউপার্জন করা যায় বটে তবে এই মুলুকে চাকরির ছড়াছড়ি এই মিথ্যাচারের খোলসা করেছে শ্রীকান্ত নিজেই। শ্রীকান্তের জবানিতে এই প্রসঙ্গ ব্যক্ত হয়েছে 'তাঁর কোন এক আত্মীয় বার্মামুলুকে চাকরি করিয়া 'লাল' হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ অতিশয় ধনবান হইয়াছে। সেখানকার পথে ঘাটে টাকা ছড়ানো আছে শুধু কুড়াইয়া লইবার অপেক্ষামাত্র। সেখানে জাহাজ হইতে নামিতে না নামিতে বাঙালীদের সাহেবরা কাঁধে তুলে লইয়া গিয়া চাকরি দেয় এইরূপ অনেক কাহিনী। পরে দেখিয়াছিলাম, এই ভ্রান্ত বিশ্বাস শুধু তাঁহার একার নহে, এমন অনেক

লোকই এই মায়া মরীচিকায় উন্মত্ত প্রায় হইয়া সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় সেখানে ছুটিয়া গিয়াছে এবং মোহভঙ্গের পর তাহাদিগকে ফিরিয়া পাঠাইতে আমাদের কম ক্লেশ সহিতে হয় নাই''। শরৎচন্দ্রের বার্মায় কর্মজীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ এই ইতিহাস 'শ্রীকান্ত' (২য়) না থাকলে ঐরকম আকাশকুসুম কল্পকথায় হয় তো আমাদের বিশ্বাস করতে হত, প্রকৃত সত্য অজানাই থাকত।

শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্বে শরৎচন্দ্র রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তের সঙ্গে আমাদের নিয়ে গেলেন ভাগলপুর-পাটনা-রেঙ্গুন-কলকাতা থেকে দূরে বাঁকুড়া জেলার গঙ্গামাটি গ্রামে। বীরভূমের এই রুক্ষ অঞ্চলে বাংলার পল্লীর পরিচিত জীবনলীলার চিত্রাঙ্কিত করলেন। গ্রামটির বৈশিষ্ট্য এখানে সমাজ কথিত 'অচ্ছুত' সম্প্রদায় সাঁওতাল-ডোম-বাউরি সম্প্রদায়ের বাস এখানে উচ্চবর্ণ হিন্দুদের বাস প্রায় নেইই বলতে গেলে 'বস্তুত, ঘর-দুই বারুজীবী এবং একঘর কর্মকার ব্যতীত গঙ্গামাটিতে জলাচরণীয় কেহ নাই! সমস্তই ডোম ও বাউরীদের বাস বাউরীয়া বেতের কাজ এবং মজুরি করে এবং ডোমেরা চাঙ্গারি, কুলা, চুপড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া পোড়ামাটি গ্রামে বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে''। শ্রীকান্তের আত্মকথনে এদের মর্মান্তিক অবস্থা ও অর্থনৈতিক সংকটের কথা ব্যক্ত হয়েছে। শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর গঙ্গামাটি যাওয়ার পথে সেবাব্রতী সাধু ব্রজানন্দ ওরফে আনন্দের সঙ্গে কথোপকথনে বিদেশিদের হাতে শোষিত ভারতবর্ষের রিক্ত-শুষ্ক রূপটি প্রকাশ পেয়েছে সে দেশের কৃষকদের এই হীনতর অর্থনৈতিক অবস্থানের জন্য দায়ী করেছে জমিদারের গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র বসবাসকে। কারণ জমিদার গ্রামে না থাকলেও খাজনা আদায়ের ভার জমিদারির মধ্যস্বত্বভোগী নায়েব-গোমস্তাদের উপরই দিয়ে যায়, তাতেই প্রজাদের সর্বনাশ ঘনিয়ে আসে।

সুনন্দা এই উপন্যাসে এক উজ্জ্বল প্রতিবাদী চরিত্র। সুনন্দা ন্যায়পরায়ণ, প্রতিবাদী দুঃসাহস নিয়ে ও সর্বত্যাগী দারিদ্র্য বরণ করে প্রজাবিদ্রোহের প্রতিনিধি হতে পারত কিন্তু জমিদারের ধনী মহাজন কুশারী কর্তার প্রতারণার বিরুদ্ধে তার বিপ্লব অহিংসপন্থী তাই প্রজাবিপ্লবের সম্ভাবনা হোঁচট খেয়েছে। তবে সুনন্দার প্রতিবাদ নীরব হলেও কার্যকরী ভাসুর কুশারী কর্তার মনোভাব বদলের পেছনে তার অনড় অবস্থান প্রশংসনীয়। যদিও এই মনোভাব বদলে দয়ার্দ্রচিত্ত জমিদারিনী রাজলক্ষ্মীর গোপন হাত রয়েছে। তথাপি তাঁতিদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া ও শ্বশুড়ের ভিটেতে সুনন্দ পুনঃঅবস্থানের সাফল্য যেন সুনন্দারই চারিত্রিক গুণাবলীর জন্য সম্ভব হয়েছে। পূর্বেই বলেছি গঙ্গামাটিতে ডোম-বাউরি সম্প্রদায়ের বাস। গ্রামাঞ্চলে এই নিম্নজাতিরা তাদেরই মধ্যে থেকেই পুরোহিত নির্বাচন করে ও মর্যাদা দিয়ে থাকে। এখানে ডোম সম্প্রদায়ের একটি বিবাহকে কেন্দ্র করে দুই পুরোহিত ব্যবসাকারীর মধ্যে দ্বন্দ্ব, তাদের মন্ত্রোচ্চারণ ও বিবাহের আদব কায়দা লেখক হাসি-ঠাট্টার স্তরে নিয়ে গেছেন।

শ্রীকান্তের তৃতীয় পর্বেই দেখা যায় সাঁইথিয়া থেকে রেলের নতুন লাইন বসছে, তাই প্রচুর কুলি-মজুরদের সমাবেশ এই অঞ্চলে। গঙ্গামাটি গ্রাম থেকে কয়েকমাইল দূরেই তাদের ক্যাম্প বসেছে। শ্রীকান্ত একদিন হঠাৎ বাল্যকালের বন্ধু সতীশ ভরদ্বাজ ওরফে

ব্যাঙকে দেখতে পেল। সতীশ এখানে রেলওয়ে সাব ওভারসিয়ারের কাজ করে, কুলিদের তদারকি করাই তার কাজ। ওই ক্যাম্পে কলেরা মহামারীর রূপ নিলে সতীশ আক্রান্ত হয়, ফলে বাল্য বন্ধু হিসাবে শ্রীকান্তর সেখানে ডাক পড়ে। শ্রীকান্ত সেখানে সতীশের সেবাশুশ্রূষার ভার নেয়, কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না, সতীশ মারা যায়। এখানেই এক কলেরা আক্রান্ত কুলি রমণীর সঙ্গে তার আলাপ হয়। তার "স্বামী নাই সে গতবৎসর আড়কাঠির পাল্লায় পড়িয়া অপর একটি অপেক্ষাকৃত কমবয়সের স্ত্রীলোক লইয়া আসামের চা বাগানে কাজ করিতে গিয়াছে"। সে সময় এই শ্রমিক শ্রেণীর মানুষদের এভাবেই বেশি মজুরির এবং অন্যান্য প্রলোভন দেখিয়ে চা বাগানের দালাল অর্থাৎ আড়কাঠিরা ধরে নিয়ে যেত এখানে তার অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি চিত্র রয়েছে।

কুলিদের ক্যাম্প ত্যাগ করে শ্রীকান্ত এরপর মাধুপুরে যান সেখানেই পরিচয় এক হেডমাস্টারের সঙ্গে। হেডমাস্টরের কথার সুরে বোঝা যায় রেলগাড়ি চালানোয় দেশের শান্তি চলে গেছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় রেল অর্থনৈতিকভাবে দেশের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে; কিন্তু পরাধীন ভারতবর্ষে সেই অর্থে শ্রীবৃদ্ধির ঘটার বদলে বিদেশি প্রভুদের হাতে লাভের অঙ্ক চলে গেছে। এতে একপ্রকার মানুষের দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রীকান্তের সঙ্গে হেডমাস্টারের কথোপকথনে রেলগাড়ি চালানো নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে বিতর্কের দুটো সুরই ফেলে দেওয়ার মতো নয়। হেডমাস্টার অবশ্য একথা স্বীকার করে নিয়েছেন যে 'মেহন্নতের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, জীবন-সংগ্রাম বুলির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে"। তবে জীবন সংগ্রাম অর্থ দিয়েছে কিন্তু তার সঙ্গে কেড়ে নিয়েছে অনেক কিছুই। এই আত্মোপলব্ধি শুধু হেডমাস্টারের নয় বর্তমানে প্রতিটি মানুষেরও। জীবন সংগ্রামের চাপে অহেতুক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মানুষ বড়ো যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে সহজ সরল জীবনের আনন্দটুকু আজ যেন নির্বাসন দণ্ড ভোগ করছে। শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্বেই মামুদপুর থেকে গঙ্গামাটিতে ফেরার পথে শ্রীকান্ত এক অচেনা গাঁয়ের শেষ সীমান্তে একজন অগ্রদানী ব্রাহ্মণের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। এখানে ব্রাহ্মণ সমাজে অগ্রদানী সম্প্রদায়ের দুর্দশার চিত্রটি তুলে ধরেছেন শরৎচন্দ্র। পরবর্তীকালে এই অগ্রদানী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে নিয়েই তারাশংকরের বিখ্যাত ছোটগল্প 'অগ্রদানী' রচিত হয়েছে।

'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসে 'মহাকুলীনদের ফালাও ব্যবসাও অর্থনৈতিক পীড়নের চিত্র পেয়েছি আমরা। কিন্তু শরৎচন্দ্র কুলিনদের এজেন্সির যে নগ্ন তথ্য উপস্থিত করলেন, তা কৌলীন্যের ইতিহাসে এক নবতর সংযোজন'। আসলে হিরু নাপিতের বৃদ্ধ কুলীন মনিবের ছদ্মবেশে বখেরা আদায়ের কাজ 'নূতনও নয়, আর তার মনিবই কেবল একলা করে না-এমন অনেক ব্রাহ্মণই দূরাঞ্চলে বখরার কারবারে অপরের সাহায্য নিয়ে থাকেন'। অতএব সমাজের এই নির্মম অপরাধকর্মের গ্লানি বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। শরৎচন্দ্র জাতিত্ব সংস্কারের গর্বকারীদের মর্মমূলে শুধু এই আঘাতটিই করেননি, গোলক চাটুজ্যের মতো বর্ণগরবী সমাজপতিদের অন্তঃপুর-কেচ্ছার কাহিনী শুনিয়ে জাতের নামে যারা বজ্জাতি করে তাদেরও একহাত নিয়েছেন। বিপত্নীক সমাজপতি গোলক চাটুজ্যে বিধবা শ্যালিকাকে আটক করে তার গর্ভে সন্তানোৎপাদন করে তাকে ধামা চাপা দেওয়ার

বন্দোবস্তে প্রিয় ডাক্তারের মতো সজ্জন লোকও আক্রান্ত হয়েছে। অথচ বৃত্তি উন্মাদ এই সরল লোকটি সাংসারিকভাবে অচল হলেও মহানুভবতার উজ্জ্বল। সে হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা করে গ্রামে গ্রামে রোগ সারিয়ে বেড়ায়। ঔষধ নির্বাচনে তার নিজের ডাক্তারিবিদ্যা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস পূর্ণমাত্রায় রয়েছে। তাই সে বলেছে : 'আমার কি নাবার-খাবার ফুরসত আছে? তোরা ভাবিস? যে রোগীটির কাছে না যাব তারই রাগ, তারই অভিমান'। কিন্তু এই আপনভোলা সংসার নিরাসক্ত মানুষটির জন্মরহস্য তাকে নিরুদ্দেশের পথে প্রেরণ করল। শরৎচন্দ্র কাহিনীর চূড়ান্ত পর্বে তার গ্রাম থেকে প্রস্থানকালে শখের ডাক্তারির উপকরণ ছাড়তে না পারার বেদনাকর পরিস্থিতির চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। এই উপন্যাসে সন্ধ্যার বামুনের মেয়ে পরিচয়ের মিথ্যাভারে তার সমগ্র অস্তিত্ব বিপন্ন করেছে। বিবাহ বাসরে লগ্নভ্রষ্ট হওয়া থেকে রক্ষার জন্য সন্ধ্যা যখন অরুণের কাছে ছুটে যায়, তখন চিন্তান্বিত অরুণের চুপ করে থাকা তাকে স্বাধীন পথের সন্ধান দিয়েছে। অরুণের প্রতি বিদায়ী তার উক্তিতে এর পরিচয় পাওয়া যায়—'মেয়ে মানুষের বিয়ে করা ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন কাজ আছে কিনা, আমি সেইটে জানতেই বাবার সঙ্গে যাচ্ছি'। এহেন সংলাপ শরৎসাহিত্যেই প্রথম। অনন্যোপায় নারীর সংসারভিমুখী না হয়ে এই স্বাধীন পথ সন্ধানের চেষ্টায় সন্ধ্যা চরিত্রটি স্বতন্ত্রতার দাবি করে। আমরা কাহিনীতে দেখেছি সন্ধ্যা, পিতা প্রিয় মুখুজ্জের কাছ থেকে হোমিওপ্যাথি শিখেছিল। সন্ধ্যা হয় তো পিতার সঙ্গে নতুন জায়গায় গিয়ে চিকিৎসাই করবে।

এই গোলক চাটুজ্যে আবার চোঙাদারের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকায় ছাগল-ভেড়া চালান দেবার গোপন কারবার করে। এই ভণ্ড হিন্দু ধর্মের রক্ষাকর্তার গরুচালানে টাকা ধার দিতেও আপত্তি নেই। শুধু সুদটা বেশি মাত্রায় পেলেই হল। পেশায় প্রতিদ্বন্দ্বী আহম্মদ সাহেবও সাতশো পশু চালানের কন্ট্রাক্ট পেয়েছেন। তিনি আর বেশি পশু চালানের কন্ট্রাক্ট পেতেন, শুধু টাকার অভাবে সাহস করছেন না। তাই গোলক তাঁকে কর্জ দিতেও রাজি; সুদু সুদের মাত্রাটা বাড়াতে হবে। গোলক গরু চালানে অর্থসহায়তা করলেও হিন্দু সমাজে নিন্দার ভয় তার নেই। যুদ্ধের সময় এই গরুচালানের ব্যবসাদারদের পোয়া বারো, গোলককে এই আহম্মদ সাহেবের সম্পর্কে বলতে শুনি—'লড়াইটা বেশিদিন চললে ব্যাটা দেখচি লাল হয়ে যাবে'। শরৎচন্দ্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সুবিধাবাদী মানুষদের খুব কাছে থেকে দেখেছেন, এই অভিজ্ঞতাই তাঁর উপন্যাসে বাস্তবায়িত হয়েছে। গোলকের মতো গোপন পশুচালানকারীদের, সুবিধাবাদী মহাজনদের প্রকৃতিকে তাই তিনি ভালভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন।

'শুভদা' (১৯৩৮) উপন্যাসে নেশাড়ু হারান মুখুজ্জে কুড়ি টাকা বেতনের কর্মচারী। তার নেশার জন্য অতিরিক্ত অর্থসংস্থানের প্রয়োজন, তাই মনিবের তহবিল তছরুপ করে সে হাজতবাস করেছে। নেশায় আত্মনিয়ন্ত্রণে অক্ষম এই চরিত্রটি বারবারকে রুগ্ন পুত্রের ফল আনার ভরসা দিয়ে গাঁজার আড্ডায় গিয়ে ঢোকে। ফলে অর্থাভাবে অসুস্থ পুত্রের অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে থাকে। স্বামীর প্রতি স্ত্রী শুভদার অত্যাধিক আনুগত্য এক্ষেত্রে অনেক দায়ী করেছেন। নারীর কঠিন শাসনে থাকলে হয় তো এই শ্রেণীর চরিত্রের স্খলন

এভাবে ঘটত না। উপন্যাসের শেষ দৃশ্যতেও এই চরিত্রটি ডাকাতের ছদ্মবেশ ধরে স্ত্রী শুভদার হঠাৎ পাওয়া পঞ্চাশ টাকা হস্তগত করতে এসে স্ত্রীর কাছে ধরা পড়ে যায়। কর্মহীন গৃহস্বামী নেশাগ্রস্ত হয়ে সর্বস্ব খোয়ালে শুভদার বিধবা বড়ো কন্যা ললনা ওরফে মালতী সংসার বাঁচানোর জন্য রূপোপজীবিকাকে উপার্জনের পথ হিসেবে বেছে নেয়। তবে ললনার মতো গ্রাম্য যুবতী, যে শুভদার মতো মায়ের ঔচিত্য শিক্ষায় লালিত-পালিত হয়েছে তার এইরকম নীতি সংস্কার বহির্ভূত স্খলনকে অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। হয় তো বিকল্প জীবিকা ব্যবস্থা সে যুগে না থাকার দরুন এক বাল্য বিধবাকে দিয়ে এর চেয়ে বেশি কিছু করানো যেত না। ললনা যে সময় গৃহত্যাগ করে সে সময় বিধবা গ্রামীণ গ্রাম্য মহিলারা শহরাঞ্চলে গিয়ে হয় পাচিকা বৃত্তি, না হয় বেশ্যা বৃত্তি গ্রহণ করত। তাই সুরেন্দ্রনাথ চাটুজ্জের বজরায় আশ্রিত ললিতাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় সে কলকাতায় গিয়ে কি করবে; উত্তরে বলেছে সে পচিকা বৃত্তি গ্রহণ করতে চায়। কিন্তু এটা ছিল তার ছলনা। কারণ সেসময় পাচিকা বৃত্তি নিয়ে নিজের ভরণ-পোষণ হলেও পরিবার প্রতিপালন একপ্রকার অসম্ভব ছিল। কথায় কথায় সুরেন্দ্রনাথ যখন জানতে পারে যে মালতী অধিক অর্থ উপার্জনের আশায় কলকাতা ছাড়া অন্য কোথাও পাচিকা বৃত্তিতে যেতে রাজি নয়, তখন বিচক্ষণ সুরেন্দ্রনাথ তার কলকাতা আসার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারে। তাই সুরেন্দ্রনাথ তাকে ভালোবেসে নিজের কাছে রেখে দিয়ে তার বহুভোগ্যা হয়ে থাকার অনিশ্চিত অবস্থা থেকে মুক্তি দিলেন। মালতীকে ভালোবেসে তার দুঃখের কথা শুনে তার পরিবার প্রতিপালনের জন্য বৃত্তির বন্দোবস্ত করে দিলেন।

একান্নবর্তী পরিবারগুলো বিচ্ছেদ ও ভাঙনের শিকার হয়েছে তার পেছনে কারণ হল বৃত্তিগত উপার্জনে সংসারে একজনের সঙ্গে অপরজনের দৃষ্টিকটু প্রত্যক্ষ ফারাক। এই পরিবারে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিধারী ব্যক্তির টাকার অঙ্কের ফারাকই পৃথক হয়ে নিউক্লিয়ার পরিবারের সৃষ্টি করেছে। সামন্তযুগে যেখানে একান্নবর্তী পরিবারের সকল উপার্জিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এক সংহতি ছিল, সেখানে একজন প্রভাবশালী অভিভাবক থাকত। বর্তমানে এই প্রভাবশালী অভিভাবক বিহনেই ভাইয়েরা অর্থনৈতিক বিরোধের পথে নেমে অখণ্ড পরিবারের থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার কথা ভাবছে। শরৎচন্দ্র তাঁর গল্প উপন্যাসে এই সমস্যাটিকে তুলে ধরেছেন। শরৎসাহিত্যে একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনের চিত্রের পরিচয় 'অরক্ষণীয়া' উপন্যাস রয়েছে। যদিও অনেকে এই উপন্যাসকে বাংলাদেশের পল্লীসমাজের কুমারী মেয়েদের বিবাহ সমস্যার প্রতিবেদন হিসেবে ধরেছেন। কিন্তু এর সঙ্গে আর একটি সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তা হল: স্বামীহারা বিধবার সংসারযাত্রা নির্বাহের অর্থনৈতিক সংকট যা এই উপন্যাসে দুর্গামনী চরিত্রটির দ্বারা পরিস্ফুট। বিধবার অনূঢ়া রূপহীনা মেয়ের বিশাল সামাজিক ভার যখন স্বামীর সহদরেরা বাড়তি বোঝা বলে নিতে অস্বীকার করে তখন অভিভাবকত্বহীন নারী দিশেহারা হয়ে পড়ে। এই উপন্যাসে সেই সমস্যার প্রসঙ্গ শুনিয়েছেন শরৎচন্দ্র।

শরৎসাহিত্যে জীবিকার অন্ত নেই, শরৎচন্দ্র নিজেও বার্মা বাসকালীন পর্বে নানা জীবিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। কখনো ওখানকার রেলওয়ে বোর্ডের বিভিন্ন কর্মের সঙ্গে

যুক্ত ছিলেন। কখনো বা তাঁর সুকণ্ঠ খ্যাতির জন্য বার্মার ডেপুটি এগজামিনার অফ আকাউন্টস মনীন্দ্রকুমার মিত্রের বাড়িতে আশ্রয় পান, মনীন্দ্রবাবুর সুপারিশেই তিনি পঞ্চাশ টাকা বেতনের চাকরিও পান। পরবর্তীকালে আবার দেশে ফিরে এসে লেখা-লেখিকেই জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। গ্রাম ও শহরাঞ্চলে নানাস্থানে ঘোরাঘুরির কারণে বহু বৃত্তিজীবী মানুষকে কাছ থেকে দেখেছেন এই অভিজ্ঞতাই তাঁকে উপ্যাসের চরিত্র নির্মাণে সহায়তা করেছে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সুখ দুঃখ মন্থন করেই শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টি হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১. নারায়ণ চৌধুরী। উত্তর-শরৎ বাংলা উপন্যাস। জিজ্ঞাসা। কলকাতা। কলকাতা বিদ্যালয়ের শরৎ-স্মৃতি বক্তৃতা-১৯৭৬। মে,১৯৮০। প্রি-১-২।

২. ক্ষেত্র গুপ্ত। বাংলী সাহিত্যের ইতিহাস ৩। গ্রন্থনিলয়। কলকাতা। ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৪০৭। পৃ. ২১৯।

৩. জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। শরৎসাহিত্যে ব্যক্তি ও সমাজ। করুণা প্রকাশণী। কলকাতা। আশ্বিন-১৪০৬। পৃ. ১৫০।